চলে চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান দুটি মাত্রা বা ধারা বিদ্যমান ছিল— একটি হ'ল- পঞ্চোপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈষ্ণবীয় ধর্মচর্চা; অন্যটি হ'ল— বৈষ্ণব পদ, গান ও কবিতা। এর সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর মধুর রসে কৃষ্ণোপাসনা এবং অদ্বৈত আচার্যের 'ভগবত-পুরাণ' চর্চার কথাও মনে রাখতে হবে।

দুই

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনানুসারে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। আর শ্রীরাধা হলেন তাঁর হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ-শক্তির ঘনসার বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ; পরতত্ত্বের বিষয়। শ্রীরাধা মাধুর্য প্রতিমা; তিনি পরতত্ত্বের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ে পরম শক্তিমান ও পরমাশক্তি রূপে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন; কিন্তু লীলা হেতু তাঁরা পরস্পর পৃথক। তাঁদের এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য কিন্তু নিত্যসত্য। নিত্যকিশোর ও নিত্যকিশোরী রূপে তাঁদের যুগললীলা অনাদি অনন্তকাল ধরে চলেছে ধামশ্রেষ্ঠ নিত্যবৃন্দাবনে। রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের যুগললীলা মাধুরীর ভাববিস্তার যে তত্ত্বের আধারে বিধৃত তা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত। এই মতবাদ বা তত্ত্ব মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভক্তিদর্শন ও সাহিত্যে বাঙালীর মনন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মর্ত্যে আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১৪৮৬ খ্রী.)। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদলীলায় যে অপার্থিব রাধা প্রেম মর্ত্যলোকে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তাকে একটি দার্শনিক তত্ত্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীচৈতন্যেরই কৃপাধন্য বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী। এঁরা হলেন— সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, ও গোপাল ভট্ট। এঁদের মধ্যে সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী শুধু উচ্চকোটির সাধকই নন, তাঁরা ছিলেন কবি ও দার্শনিক। বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্ব, ভক্তিদর্শন, অলঙ্কার ও রসপ্রস্থান বিষয়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁরা রচনা করেছেন যার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের গভীর ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। ষড় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাসের শিষ্য কবি, সাধক ও তত্ত্বজ্ঞ মনীষী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও গৌরতত্ত্বকে সমন্বিত করে যে 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্য লিখলেন তা মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা সাহিত্য ও দর্শনের এক অক্ষয়-কীর্তি। বৃন্দাবনের পূর্বোক্ত ষড়গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ— এঁদের তত্ত্বালোচনার প্রধান আধার ও আশ্রয় হ'ল 'ভাগবত পুরাণ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পুরাণাশ্রয়ী এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করার আগেই লোক জীবন-সম্পৃক্ত সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং বাংলা কাব্য কবিতায় রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বিচিত্র বর্ণে। তাই বলে অবশ্য, রাধা-কৃষ্ণ প্রেম প্রথমে লৌকিক এবং পরে তা দিব্যরূপ লাভ করেছে— এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলবে না।

রাধা-কৃষ্ণ যুগল লীলার মূল প্রোথিত আছে— 'ঋক্-পরিশিষ্ট' এবং 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের মিথুনতত্ত্বে ও দ্বৈতলীলায়। আবার এর সঙ্গে গভীর সংযোগ আছে দীর্ঘকাল লালিত ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া সঙ্গত যে, ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বিত দ্বৈতলীলা, চৈতন্যোত্তর সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'আরোপ-তত্ত্ব' ও দেহসাধনার মধ্যে এক ভিন্ন রূপ লাভ করল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসারে, জীব কখনো শ্রীরাধা হতে পারে না, বড় জোর শ্রীরাধার সখী-অনুগত মঞ্জরী হতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত নিত্যবৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণ-লীলার দ্রষ্টা ও সেবা-পরিকর মাত্র। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সহজিয়া বৈষ্ণবগণ জীবদেহেই রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের 'আরোপে'র মধ্য দিয়ে রাধা ভাবের সাধনা করেছেন। এঁদের এই সাধন প্রণালী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শ্রীচৈতন্য আপন দিব্য ভাব জীবনে অলোকসামান্য প্রেম সাধনার মধ্য দিয়ে আপামর জনমানবকে এক শুদ্ধসত্ত্ব ভাগবত জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ— এই সুপরিচিত চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে তিনি প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ হিসেবে ঘোষণা করলেন। আর এর ফলে গৌড়বঙ্গবাসীর চেতনালোকেই ঘটে গেল এক আমূল পরিবর্তন। শ্রীচৈতন্য দ্বৈতবাদী মাধ্ব শিষ্য হলেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এক ভিন্ন উপাস্যতত্ত্ব, তার লক্ষ্যও ভিন্নতর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সে উপাস্যতত্ত্ব হ'ল— রাধাকৃষ্ণ; আর তার লক্ষ্য হ'ল— পরমপ্রেম। শ্রীচৈতন্য ছিলেন অদ্বৈত-বেদান্তবাদের বিরোধী। অদ্বৈতবাদ উপনিষদে বর্ণিত জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ-কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের 'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্যকে চৈতন্য স্বীকার করেন নি। শঙ্করাচার্য ছিলেন বিবর্তবাদী। তাঁর মূল বক্তব্য হ'ল— 'আত্মৈকত্ব'। অর্থাৎ একই আত্মা ভ্রান্তিবশত বহু জীব ও জগৎ বলে প্রতীয়মান হয়। শঙ্করাচার্যের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাহপর", জগৎ হ'ল ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দ্বৈতত্ব নেই, তাই অদ্বৈতবোধের ধারণা। অদ্বৈতবাদীদের মতে, জগৎ মায়িক, তার কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। জগৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে রজতভ্রমের তুল্য অলীক (illusion) মাত্র। অবিদ্যা জীবকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে আত্মার স্বরূপকে আবৃত করে। অদ্বৈতবাদ অনুসারে, এই অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন করে জীবের আত্মচৈতন্যের জাগরণ বা ব্রহ্মকৈবল্য লাভই হ'ল মোক্ষ— যা তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও কাম্য। শ্রীচৈতন্য তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক ও দার্শনিকগণ জীব ও জগতের এই প্রতিভাসিক সত্যতা অর্থাৎ মিথ্যাত্বের বিরোধী। এঁদের মতে, "জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়।" শুধু জগৎ নয়, জীবও মিথ্যা নয়; জীব হ'ল ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণের 'জীবশক্তি' বা 'তটস্থা শক্তি'রই প্রকাশ। প্রাকৃত জগৎ ব্রহ্মের 'বহিরঙ্গ' মায়াশক্তি'র পরিণতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শঙ্করাচার্যের মতো বিবর্তবাদী নন, তাঁরা পরিণামবাদী। এঁদের মতানুসারে, জীব ব্রহ্মের 'স্বরূপ শক্তি' নয় আবার সে ব্রহ্মের 'মায়াশক্তি'র অন্তর্গতও নয়— জীব এই দুয়ের মধ্যস্থ অর্থাৎ তটস্থ, সমুদ্র ও ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী যেমন সমুদ্রতট তেমনই। জীব যেমন স্বয়ং ব্রহ্ম নয়, তেমনি

ও তাঁর শক্তি (বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা) - এই দুয়ের মধ্যে আছেন চিরবিরাজমান অথচ ভেদাভেদ প্রতীত হয়। এই পরস্পরবিরোধী ব্যাপার কীভাবে সম্ভাবিত হতে পারে তা সাধারণ মানুষ প্রাকৃত নিয়মে বুঝতে পারে না, তাই এই ভেদাভেদবাদ 'অচিন্ত্য'।

আগেই বলেছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্বের ভিত্তি প্রোথিত আছে 'ভাগবতপুরাণ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুসারে "আরাধ্য: ভগবান ব্রজেশতনয় স্তদ্ধামং বৃন্দাবনং। / রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।।" — ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য। বৃন্দাবন তাঁর নিত্যবিহারলীলাধাম। ব্রজগোপীগণের রমনীয় উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। প্রেমভক্তিই পরম ও চরম পুরুষার্থ। বৈষ্ণবের পরমারাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম শক্তিমান এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। বিভিন্ন পুরাণে ভগবানের ত্রিবিধ শক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'বিষ্ণুপুরাণে' এ সম্পর্কে বলা হয়েছে —

"বিষ্ণুশক্তি: পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।" (৬/৭/৬১)

- অর্থাৎ বিষ্ণুর (শ্রী ভগবানের) শক্তি 'পরা' 'ক্ষেত্রজ্ঞা' ও 'অপরা' নামে অভিহিত। কর্মসংজ্ঞক অবিদ্যা (বা অপরা) তৃতীয় শক্তি।

এই উক্তির নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই — ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার — (১) 'পরা' শক্তি বা 'স্বরূপ' শক্তি। একে 'চিচ্ছক্তি' ও বলা হয় কারণ এটি জড় বিরোধী ও চিন্ময় শক্তি। এটি শ্রেষ্ঠ 'অন্তরঙ্গা' শক্তি; কারণ এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ নিবিড়তম। (২) 'ক্ষেত্রজ্ঞা' বা 'তটস্থা' শক্তি। এটি জীবশক্তি। (৩) 'কর্মসংজ্ঞা' বা 'অবিদ্যা' বা 'অপরা' বা 'মায়া' শক্তি। এটি বহিরঙ্গা শক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ত্রিবিধ শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। এই দর্শন-অনুসারে 'স্বরূপশক্তি' বা 'অন্তরঙ্গা' শক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদিধামে ও নিত্য পরিকর-রূপে স্বরূপ বৈভবে অবস্থান করেন। অর্থাৎ আমাদের ধ্যানের জগতে স্বরূপ শক্তিতে বিরাজ করেন। যেখানে তিনি লীলাবিলাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, নন্দ-যশোদা ও গোপ-গোপীরূপ পরিগ্রহ করেছেন। 'জীবশক্তি' দ্বারা তিনি 'বিভেকাত্মতত্ত্ব -জীব' রূপে অবস্থিত। ক্ষুদ্র জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবানের এই শক্তি বিরাজিত। আর 'বহিরঙ্গা' বা 'মায়া' শক্তি বলে ভগবানের জড়াত্মপ্রধান প্রকৃতিরূপে অবস্থান। সমস্ত স্থাবর বা জড়পদার্থে ভগবানের এই অবিদ্যা বা 'মায়া'শক্তির প্রকাশ। 'ক্ষেত্রজ্ঞা' বা 'জীব' শক্তি হল অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ'-শক্তি এবং বহিরঙ্গা 'মায়া' শক্তির মধ্যবর্তিনী এক 'তটস্থা'শক্তি। যেমন সমুদ্রের তট, সমুদ্র ও ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী। সে যেমন সমুদ্রের অন্তর্গতও নয় আবার তার বহির্ভূতও নয়, তেমনই জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 'চিচ্ছক্তির' অন্তর্গত নয় আবার তার বহিরঙ্গা 'মায়া-শক্তি'রও অন্তর্ভুক্ত নয়। উভয় কোটিতেই জীবের প্রবেশের অভাব আছে। কিন্তু আবার উভয়কোটিতে প্রবেশের সামর্থ্যও আছে। জীবশক্তির আবার দুটি বর্গ - একটি অনন্তকাল ধরে ভগবৎ - উন্মুখ, আর অন্যটি অনাদিকাল থেকে ভগবৎ-

পরাঙ্মুখ। প্রথম বর্গের জীব শ্রীকৃষ্ণের 'অন্তরঙ্গ।' 'স্বরূপ-শক্তি'র বিলাসের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে বৈকুণ্ঠধামে নিত্য ভগবৎ পরিকরত্ব অর্জন করে। দ্বিতীয় বর্গের জীব 'বহিরঙ্গা' 'মায়া-শক্তি'র দ্বারা পরিগৃহীত হয়ে সংসার বদ্ধ হয়। অবশ্য 'জীবশক্তি' ও 'মায়াশক্তি' পরস্পর পৃথক। 'জীবশক্তি' চৈতন্যস্বভাব, কিন্তু 'মায়াশক্তি' জড়স্বভাব। জীব এবং ব্রহ্ম বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে 'জীবশক্তি' তাঁর অংশমাত্র। জীব শুদ্ধস্বরূপশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণের অংশ নয় — তাঁর জীবশক্তি-বিশিষ্ট রূপেরই অংশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে পরম মাধুর্যময় ও প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ লীলার জন্যই বৃন্দাবনে বিভিন্ন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। কিন্তু এই বিভিন্ন প্রকার রূপ সত্ত্বেও শ্রী ভগবানে স্বগতভেদ নেই, কারণ সেখানে একই প্রকার উপাদান থাকায় দেহ ও দেহীতে ভেদ অনুপস্থিত। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' বাদে এভাবে অভেদবাদ যেমন স্বীকৃত তেমনি ভেদবাদও প্রপঞ্চিত হয়েছে। এক শ্রী ভগবান থেকেই জীব ও জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তথাপি এ দুই ক্ষেত্রে ভগবানের শক্তি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে তাই তারা পরিণামের অন্তর্গত। জড়-জগৎ অচিৎ; এ ভগবানের স্বরূপ শক্তির বিপরীত দিক থেকে জীবকে সততই মোহগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। জীবশক্তি — স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী তাই একে 'তটস্থা' শক্তি বলা হয়েছে। এই জীবশক্তি শ্রীভগবানের 'বহিরঙ্গা' শক্তির প্রভাবে যেমন মোহগ্রস্ত হতে পারে, তেমনি আবার শ্রীভগবানের সাধনা করে তাঁর স্বরূপ কোটির একান্ত সান্নিধ্যও লাভ করতে পারে। এই জীব ও জড় জগৎ একই শ্রীভগবান থেকে সৃষ্ট হলেও, আর তাঁর সঙ্গে একাকার হতে পারে না। যদিও জীবের কাম্য ভগবানের স্বরূপ কোটির একান্ত সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে শ্রীভগবানের নিত্যমধুরলীলা অবলোকন করা, কিন্তু জীব কখনো শ্রীভগবানের সঙ্গে সাযুজ্য মুক্তি চাইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে জীব অণু স্বভাব — সঙ্কীর্ণতার দিকেই তার প্রবণতা, অন্যদিকে শ্রীভগবান স্বরূপ কোটিতে বিধুস্ব ভাব — তাঁর প্রবণতা ব্যাপ্তির প্রতি। এই জন্যই জীব ও ভগবান — দুই বিপরীতধর্মী সত্তা — কখনো পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিত হতে পারে না। অবশ্য একথাও সত্য যে, জীব লয় মুক্তি বা ভগবানের সঙ্গে নিঃশেষে মিলতে চায় না, কারণ তাহলে পৃথক সত্তার লোপে শ্রীভগবানের পরম মাধুর্য সম্যক্ আস্বাদন করা সম্ভব হবে না। জীব চায়, ভগবানের এই পরম মাধুর্যের পূর্ণ আস্বাদন।

শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ ও রস স্বরূপ। তিনি বিশেষ্য। আর 'স্বরূপ-শক্তি' 'তটস্থা-শক্তি', ও 'মায়া-শক্তি' হ'ল তাঁর বিশেষণ। 'স্বরূপ-শক্তি' থাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণ লীলা (পরকীয়া লীলা) করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের 'স্বরূপ-শক্তি' মূলত: ত্রিবিধ — 'সন্ধিনী', 'সংবিৎ' ও 'হ্লাদিনী'। এই তিনশক্তি গুণবর্জিত বা ত্রিগুণাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর স্বরূপশক্তির অন্তর্গত হয়ে আছে এই তিনশক্তি —সৎ, চিৎ ও আনন্দ শক্তি। সদংশে এটি 'সন্ধিনী', চিদংশে 'সংবিৎ' এবং আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' শক্তি।

"সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।।"

'সন্ধিনী' হল অস্তিত্বরূপা, 'সংবিৎ' জ্ঞানরূপা আর 'হ্লাদিনী' হল আনন্দ ও প্রেমরূপা শক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই 'হ্লাদিনী' শক্তির ঘনসার বিগ্রহ হলেন শ্রীরাধা। এই 'হ্লাদিনী'র সার হ'ল 'প্রেম'। এই 'প্রেম'ই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবের পর্যায় অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করে 'মহাভাব'-এ। এই 'মহাভাবে'র আবার চারটি স্তর - 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়', 'মোদন' ও 'মাদন'। 'মাদন'ই প্রেমের সবচেয়ে ঘনীভূত স্তর — এটি 'স্বয়ংপ্রেম'। হ্লাদিনীর শ্রেষ্ঠ সার এই মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিদ্যমান, অন্যান্য ব্রজগোপীদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র 'আদিলীলা'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন — 'মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরানী'।

বিভিন্ন পুরাণ ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র অনুসারে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা-স্বরূপ-শক্তি-শ্রেষ্ঠা। তিনি অন্তরঙ্গে স্বকীয়া কৃষ্ণকান্তা, কিন্তু লীলার্থে পরকীয়া নায়িকা। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন - "পরকীয়াভাবে অতিরসের উল্লাস।' স্বরূপত: শক্তিমান ও শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পরস্পর অভেদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাধাকৃষ্ণের অভেদত্ব বর্ণনা করেছেন এভাবে —

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।।
মৃগমদ্ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।।"[৫] (৯৫-৯৭)

অচিন্ত্য কৃষ্ণ শক্তিবলে অভেদে লীলাবিলাসে ভেদ— এই হ'ল গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে'র মর্মরহস্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান স্বরূপতঃ অভেদ কল্পিত হয়েও আবার ভেদ জ্ঞান কেন? বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও দার্শনিকগণ এর উত্তর দিয়েছেন এই যে, উভয়ে স্বরূপত এক হয়েও লীলাচ্ছলে দুই বা যুগল। প্রকটলীলায় কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞান আচ্ছাদিত ক'রে তাঁদের মধ্যে যুগল ভাব এবং পরকীয়া ভাবের সৃষ্টি করেন। স্বরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত করে কেন এই পরকীয়া ভাবের সৃষ্টি? এর উত্তর কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় দিতে হয়— 'পরকীয় ভাবে অতিরসের উল্লাস' ভগবান শ্রী কৃষ্ণের এই রসাস্বাদনের

জন্যই এই পরকীয়া ভাবের সৃষ্টি। প্রসঙ্গটিকে আর একটু বিস্তৃত করে বলতে পারি— কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সর্বদাই হয়। তাঁর এই লীলা কখনও প্রকট আবার কখনও বা অপ্রকট। অপ্রকট কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের প্রেয়সীগণ পরস্ত্রী। রূপ গোস্বামীর মতে, তাঁরা পরস্ত্রী হলেও তাঁদের পতিদের সঙ্গে তাঁদের কখনই যৌন সম্বন্ধ থাকে না। স্বামী সঙ্গে বাসকাল, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁদের কোনরূপ বাস্তব অস্তিত্বই থাকে না। ফলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই পরস্ত্রী সম্ভোগ-পাপে লিপ্ত হন না। তবে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যা সম্ভব সাধারণ মানুষের পক্ষে তা পাপ। তাই মানুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করা অনুচিত বা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলা তার ভক্তবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্তই।

নিবিড় ভক্তি থেকে উৎসারিত, কৃষ্ণে নিবেদিত প্রেমের ছটি স্তর বিদ্যমান। এগুলি হ'ল — ব্রহ্মানন্দ, শান্তরতি, প্রেমভক্তি অথবা দাস্যরতি, সখ্যরতি,বাৎসল্যরতি এবং মধুর রতি। সর্বোচ্চ স্তর হ'ল মধুর রতি; এতে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিকরূপে পূজিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় —

"গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।।"

অর্থাৎ প্রেমিক রূপে কৃষ্ণোপাসনায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য রতি মিশ্রিত হয়। আর একটা কথা, শ্রীকৃষ্ণ চিরপ্রেমিক, চিরকিশোর। কৃষ্ণপ্রেমে কাম দেখা দিলেও তাতে কাম থাকে না। আবার কৃষ্ণ প্রণয়িনী গোপীদের মনেও কামভাব থাকে না। তাতে থাকে 'মহাভাব'। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষ্য —

"গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম।।
কাম প্রেম দোঁহাকার বিবিধ লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় মহাবল ।। ...
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্বর।।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনায় 'রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বে'র সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে 'গৌরতত্ত্ব'। শ্রী গৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু বাইরে তিনি রাধার গৌর-কান্তি নিয়ে আবির্ভূত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই গৌর-তত্ত্বের মূল নিহিত আছে 'ভাগবত-পুরাণে'র এই শ্লোকটিতে —

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" (১১/৫/৩২)

অর্থাৎ "যাঁরা সুমেধা তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞে সেই কৃষ্ণবর্ণনাকারী এবং কান্তিতে অকৃষ্ণবর্ণকে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসহ যজ্ঞনা করে থাকেন।"

এই বর্ণনা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলে যায়। তাই বলা হয়, দ্বাপরে ব্রজধামে লীলার্থে পৃথক রাধাকৃষ্ণ কলিতে নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্যরূপে ঐক্যমূর্তি ধরে আবির্ভূত হন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে দুটি প্রামাণ্য শ্লোক উৎকলিত করেছেন।

প্রথম শ্লোকটি হ'ল —

১) "রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদ্
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।"

- অর্থাৎ "রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকার বা গাঢ় প্রেমবিলাস-রূপা মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। তাঁরা স্বরূপতঃ একাত্মা হয়েও অনাদিকাল থেকে ভুবনে (গোলোকে) লীলার্থে ভিন্ন ভিন্ন দেহধারণ করেছিলেন। অধুনা প্রকট মাধুর্যমূর্তি শ্রীচৈতন্যে উভয়ে একীভূত। শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তির দ্বারা সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে প্রণাম করি।"

দ্বিতীয় শ্লোকটি হ'ল —

২) "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।"

শ্লোকটির নির্গলিতার্থ এই যে, - দ্বাপরে প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় এবং শ্রীরাধা প্রেমের আশ্রয় হওয়ায় শ্রীরাধার প্রেমের পূর্ণ আস্বাদন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই দ্বাপর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছা অপূর্ণ ছিল। সেগুলি হ'ল — ক) শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কিরূপ? খ) ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদিত আমার বা শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্যই বা কিরূপ? এবং গ) আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখানুভব হয়, তার স্বরূপই বা কি? নিজে রাধা না হ'লে তো শ্রীকৃষ্ণের ঐ তিনটি বিষয় অনুভব ও আস্বাদনের বাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে না। তাই এই তিন অপূর্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্ররূপে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবির্ভূত হলেন। বলা বাহুল্য দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়রূপে থেকে আশ্রয়রূপ শ্রীরাধার প্রেম ও তজ্জনিত আনন্দের আস্বাদন করতে পারেননি। তাই তিনি একই সঙ্গে প্রেমের বিষয় ও

আশ্রয় দুই রূপকে আত্মীকৃত করে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রাধাভাবে ভাবিত হয়ে রাধার ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি কৃষ্ণ অন্বেষণ করেছেন। আবার অন্তরে কৃষ্ণ হয়ে শ্রীরাধার গভীর প্রেমার্তির আস্বাদন করেছেন। এই গৌরাঙ্গ একই দেহে রাধা-কৃষ্ণের যুগ্ম সত্তার জীবন্ত বিগ্রহ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর বাসুদেব ঘোষের পদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হৈত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে।।"

চৈতন্যচরিতামৃত'কার কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন —

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঁই।।"

চার. সহজিয়া বৈষ্ণব মতে রাধা-কৃষ্ণ ভাবনা ও সাধনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের আলোচনার পর সেই প্রেক্ষিতে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ভাবনা ও সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সঙ্গে এর পার্থক্যটি এবং সেই সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের থেকে এর বিচ্যুতির স্বরূপটি বুঝে নিতে চাই।

চৈতন্যোত্তর যুগে, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের পরতত্ত্ব অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব এবং গৌরতত্ত্ব, লৌকিক জীবনাচরণভিত্তিক ও গুহ্যপন্থী 'সহজ সাধনা'র সংস্পর্শে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ ধারণ করে। পূর্বভারতে বৌদ্ধ মহাযানী সহজসাধনা, তন্ত্রসাধনা, নাথপন্থা ও যোগসাধনার মধ্য দিয়ে একটি দেহবাদী সাধনার ধারা জনমানসের অধিচেতনে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল। তারই উত্তরাধিকার বাহিত হয়েছে সহজিয়াদের সাধনায়। চৈতন্যের মহাপ্রয়াণের (অপ্রকট) পরে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র, 'নেড়ানেড়ী' নামে ঘৃণিত সেই সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ('বারশত নাড়া ও তেরশত নাড়ী') খড়দহ বৈষ্ণব কেন্দ্রে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে সুশৃঙ্খল জীবনের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। বাঘনাপাড়া শ্রীপাটেও রামচন্দ্র গোস্বামী নাড়া-নাড়ীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকেই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার বিস্তার ঘটেছিল।

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র বিভিন্ন তত্ত্বের সম্প্রদায়গত ব্যাখ্যা করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় নারী সংসর্গিত সাধনার কোন স্থান নেই। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর সংযমের আদর্শ রেখে গেছেন।